কে গো অন্তরতর সে

স্বামী মেধসানন্দ

রবীন্দ্রনাথ : এক অতলান্ত গভীরতা

রবীন্দ্রনাথ আশি বছরের এক পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন করেছিলেন। সে-জীবনের যেমন অপার বিস্তার তেমনই অতলান্ত গভীরতা। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার বর্ণালি অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সে-জীবন বিচিত্র সৃষ্টিসম্ভারে পূর্ণ। ব্যক্তি ও জাতির জীবনের খুব কম দিকই আছে যা তাঁর প্রতিভার সোনার কাঠি ছুঁয়ে যায়নি। এমন সর্বতোমুখী কালজয়ী প্রতিভা সর্বদেশে সর্বকালে বিরল। এ-হেন রবীন্দ্রনাথের অবদান—সে যে ক্ষেত্রেই হোক—তার সঠিক মূল্যায়ন অতীব কঠিন। যে-উৎস থেকে সেই প্রতিভার প্রবাহ উৎসারিত এবং যে-বিভিন্ন ধারায় তা প্রবাহিত, সে-সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে সে-মূল্যায়ন সম্ভব নয়—ফলত রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য আর একজনই কেবল তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন, যেমন স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ''আর একজন বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কী করে গেল!'' তাই নিজের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখে তাঁর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক আধ্যাত্মিকতা নিয়ে দু-চার কথা লিখছি।

আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূমি

যদি প্রশ্ন করা যায় রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূমি কী, তার অসংশয়িত উত্তর—সনাতন ধর্ম, যা হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত, তার সুপ্রাচীন শাস্ত্র উপনিষদ। তাঁর নিজের কথায়, ''আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে।'' ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে হিন্দুসমাজের একটি অংশ রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবে আদর্শে, চিন্তায়, কর্মে ও সামাজিক আচার- অনুষ্ঠানে ক্রমে 'ব্রাহ্মসমাজ' বলে একটা আলাদা সমাজ হিসেবে পরিচিত ও পরিগণিত হতে থাকল। কিন্তু দীর্ঘকালীন হিন্দুসংস্কার, চারপাশে হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব, হিন্দুদের সঙ্গে দৈনন্দিন আদান-প্রদান—এইসবের ফলস্বরূপ ব্রাহ্মসমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বরক্ষার ক্ষেত্রে সংশয় ও আপাত বিরোধিতার অভাব ছিল না। তা সত্ত্বেও এটি ঘটনা যে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পরিণাম, যার বেশ কিছু ইতিবাচক দিক ছিল। যেমন ধর্ম, সমাজ ও দেশের নবজাগরণে এই সমাজের পথিকৃতের ভূমিকা।[১]

ব্রাহ্মসমাজ

একদিকে সনাতনপন্থী, অন্যদিকে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার নিগড়ে বদ্ধ, শ্লথ ভারতীয় সমাজের মধ্যে যখন বেগবান আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাত এসে পড়ল, তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার একটি ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ। দ্বিতীয়টি, প্রাচীন যা কিছু তা যে উত্তম তাই প্রতিপাদন এবং তৃতীয়টি হল মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদের (যা প্রধানত পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্য) আলোকে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে যা ইতিবাচক তাকে গ্রহণ করে প্রয়োজনমতো পাশ্চাত্য

সভ্যতার মধ্যে যা ভালো তাকেও আত্তীকরণ করার প্রচেষ্টা। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন এই তৃতীয় শ্রেণির প্রতিক্রিয়ার ফলে উদ্‌ভূত। কালক্রমে যখন ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হল তখন মূল সমাজটি 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' বলে পরিচিত হল। আদি ব্রাহ্মসমাজ উপনিষদকে নিজেদের ধর্মীয় আদর্শের মূল ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছিল। উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানধারণা ওই সমাজের সভ্যদের ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে গুরুত্ব পেল। অন্যদিকে তারা হিন্দুদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রতিমাপূজা, অবতারবাদ, গুরুবাদ বর্জন করল, যদিও এ-তিনটি বৈশিষ্ট্যই ছিল যুক্তিসিদ্ধ ও অনুভবসিদ্ধ। হিন্দুসমাজও, বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মদের ভিন্ন আদর্শ ও আচার-অনুষ্ঠান ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। ফলে সেইসময় হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে পারস্পরিক নিন্দা-সমালোচনা যথেষ্ট ছিল।

উত্তরাধিকার

রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রধান অনুসারী এবং পরবর্তী কালে আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রে ব্রাহ্ম ছিলেন এবং ব্রাহ্ম পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই তাঁর প্রথম জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। ইতিবাচক প্রভাবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল উপনিষদ্‌ভিত্তিক আধ্যাত্মিকতা—যা সরাসরি তিনি তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের অনেক সন্তানের মধ্যে একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যতীত কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের ওপর সম্ভবত সেই প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি গভীর ও ক্রিয়াশীল ছিল।

'সেল্‌ফ-স্কুলড্‌'

প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক ম্যাথিউ আর্নল্ড শেক্সপিয়র সম্বন্ধে লিখিত একটি সনেটে মন্তব্য করেন যে শেক্সপিয়র ছিলেন 'self-schooled'[২]। রবীন্দ্রনাথও আক্ষরিক অর্থে তাই ছিলেন। প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা খুব কম গ্রহণ করলেও তাঁর রচনাবলি পাঠে বোঝা যায় কী বিপুল ছিল তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার। পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর নিজস্ব জ্ঞানচর্চা। পুস্তক, প্রকৃতি, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ছিল তাঁর জ্ঞানচর্চার অন্যতম অঙ্গ। সেই জ্ঞান তাঁর মননশীল, সৃষ্টিশীল প্রতিভা ও হৃদয়াবেগের জারকরসে রসায়িত হয়ে সৃষ্টি করেছে তাঁর অসাধারণ রচনাবলি। সেই রচনাবলিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তাঁর জীবনদর্শন। আবার সেই জীবনদর্শন যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তা হল ঔপনিষদিক আধ্যাত্মিকতা। তাঁর কাব্য ও সংগীতে 'জীবনদেবতা'র কথা বারবার ফিরে এসেছে। তাঁর সেই জীবনদেবতা এবং উপনিষদের ব্রহ্ম তথা পরমাত্মা অভিন্ন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় ব্রহ্ম নিরাকার কিন্তু সগুণ ব্যক্তি ঈশ্বর (Personal God); অদ্বৈত বেদান্তীর নিরাকার, নির্গুণ, শুদ্ধচৈতন্য ব্রহ্ম নন।

যেকোনও মৌলিক সৃষ্টিশীল ও চিন্তাশীল মানুষের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। তিনি কখনও থেমে থাকেননি। কী চিন্তায়, কী কর্মে, কী রচনায়—তিনি নিজেকে কোনও অচলায়তনে বদ্ধ রাখেননি। ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা 'চরৈবেতি'র পক্ষে ছিলেন তিনি।

অধ্যাত্মচেতনার ক্রমবিকাশ—প্রতিমাপূজার বিপক্ষে ও সপক্ষে

বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বলে আমরা তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমবিবর্তনের কথা আলোচনা করব। পারিবারিক সূত্রে পাওয়া ধর্মবোধকে নিজের মধ্যে একান্তভাবে অনুভব করা, যিনি 'অন্তরতর' তাঁকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা, পরিশেষে বিশ্বাসের দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সত্য-শিব-সুন্দরের স্বর্গলোকে উপনীত হওয়া—রবীন্দ্রনাথ যাকে 'ব্রহ্মবিহার' বলেছেন—তা দীর্ঘকালীন সাধনার অপেক্ষা রাখে। আজন্মলালিত সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সর্বপ্রকার 'মোহ আবরণ' ঘুচানো, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হওয়া, সর্বোপরি 'অহং'কে ত্যাগের মধ্য দিয়ে পূর্ণত্বের সাধনার কণ্টকাকীর্ণ পথ। রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনে সেই সুকঠিন সাধনার অঙ্গীকার ছিল।

দেবেন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর আদি ব্রাহ্মসমাজের

অন্যতম কর্ণধার হিসেবে সেই সমাজের প্রচারিত ও অনুসৃত আদর্শের সপক্ষে একসময় যেসব বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ রেখেছিলেন, পরবর্তী যুগে তার অনেক কিছু থেকে তিনি সরে এসেছিলেন। সম্প্রদায়-চেতনা থেকে বিশ্বচেতনায় তাঁর উত্তরণ ঘটেছিল।

একসময় হিন্দুধর্মের প্রতিমাপূজার তীব্র সমালোচনা করে তিনি লিখেছিলেন, ''মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা—যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধসকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে... মূর্তিপূজা সেই সময়েরই—যখন... ধর্ম আপন ঈশ্বরকে সংকুচিত করিয়া সমস্ত মানুষকে সংকুচিত করিয়াছে।''[৩]

কিন্তু পরে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দুর্গাপূজার প্রকৃত তাৎপর্য ও মহিমা সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবীকে লেখেন (৫ অক্টোবর ১৮৯৪), ''যেটাকে আমরা দূর থেকে শুষ্ক হৃদয়ে সামান্য পুতুলমাত্র দেখছি সেইটে কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে পুতুল-আকার ত্যাগ করে; তখন তার মধ্যে এমন একটি বৃহৎ ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার হয় যে, দেশের রসিক-অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃতধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে।... হৃদয়ের ভিতর দিয়ে কল্পনার ভিতর দিয়ে দেখতে গেলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায়—তাদের সীমা পাওয়া যায় না।... এই কারণে বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে আনন্দে, ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়।''

আদি ব্রাহ্মসমাজের ধ্যানধারণা থেকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী যুগে এতটাই সরে এসেছিলেন যে 'সমাজে'র তদানীন্তন কর্ণধাররা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবার কথা বিবেচনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। এভাবে একটি সম্প্রদায়ের গণ্ডি থেকে নিজেকে মুক্ত করে কেবলমাত্র বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্বকে তিনি তাঁর হৃদয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন বলে তাঁর পক্ষে বিশ্বভারতীর কল্পনা ও রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল। তাঁর বিশ্বভারতীর স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন ধর্মের নিষ্ঠাবান অনুসরণকারীরা ছিলেন তেমনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের, এমনকি বিদেশেরও কিছু মানুষ ছিলেন। এভাবেই বিশ্বভারতীর আদর্শ 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' বাস্তব রূপ নিয়েছিল।

বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক পরমপুরুষ তথা ব্রহ্মের কথা শুনে এসেছেন, উপনিষদের ভাবময় ও কাব্যময় মন্ত্র আবৃত্তি ও তার ব্যাখ্যা শোনার সুযোগ পেয়েছেন এবং ব্রহ্মসংগীতও গেয়েছেন। উপনয়নের সময় পাওয়া গায়ত্রীমন্ত্রের আবৃত্তি ও তার অর্থধ্যান তাঁর কৈশোরের আধ্যাত্মিক জীবনকে যে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তা তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ থেকে জানা যায়।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি

কোনও কোনও সাধকের জীবনে দেখা যায়, তাঁদের সাধনজীবনের পূর্বে বা প্রারম্ভে তেমন কোনও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি ছাড়াই বিশেষ এক আধ্যাত্মিক অনুভব বা 'রেভেলেশন' হয়েছে, দিব্য সেই অনুভব তাঁদের মনের ওপর গভীর ছাপ ফেলেছে। আবার এও দেখা যায় যে মানুষ নিজের খেয়ালি মনের কোনও কল্পনাকে দিব্যদর্শন বলে ভুল করে। কোনও দর্শন 'রেভেলেশন' না 'হ্যালুসিনেশন' তার মাপকাঠি হল—যথার্থ 'রেভেলেশনে'র আনন্দ স্থায়ী হয়, তার মধ্যে এমন এক সত্যের উপলব্ধি হয় যা চিরন্তন, সর্বোপরি যার স্মরণ মানুষকে অন্তর্মুখী করে। এই ধরনের দর্শন অনেক সময় মানুষের ব্যক্তিত্বে একটা পরিবর্তন আনে, যদিও তার স্থায়িত্ব বা গভীরতা নির্ভর করে পরবর্তী কালের সাধনার ওপর।

জীবনের প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথের অকস্মাৎ এইরকম একটা 'রেভেলেশন' হয়েছিল যাকে তিনি 'আধ্যাত্মিক'[৪] বলে উল্লেখ করেছেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে এমন এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল যা তিনি কখনও বিস্মৃত হননি এবং পরে নানা প্রসঙ্গে বারংবার তার উল্লেখ করেছেন। অবিস্মরণীয় সেই অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর স্মৃতিচারণায় সে-প্রসঙ্গ শোনা যাক :

''যখন বয়স হয়েছে, হয়তো আঠারো কি উনিশ হবে, বা বিশও হতে পারে, তখন চৌরঙ্গিতে ছিলুম

দাদার (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) সঙ্গে। এমন দাদা কেউ কখনো পায়নি। তিনি ছিলেন একাধারে বন্ধু, ভাই, সহযোগী।

''... ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গির বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলুম... দেখলুম গাছের আড়ালে সূর্য উঠছে। যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরালের থেকে, অমনি মনের পর্দা খুলে গেল। মনে হল, মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু, সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল, সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনে হল, কী অনির্বচনীয় সুন্দর। মনে হল না, তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।

''... দেখলুম, সমস্ত সৃষ্টি অপরূপ। আমার এক বন্ধু ছিল, সে সুবুদ্ধির জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল না।... সে এলে ভাবতুম, বিরক্ত করতে এসেছে। সেদিন তাকেও ভালো লাগল। তাকে নিজেই ডাকলুম। সেদিন মনে হল, তার নির্বুদ্ধিতাটা আকস্মিক, সেটা তার চরম ও চিরন্তন সত্য নয়। তাকে ডেকে সেদিন আনন্দ পেলুম। সেদিন সে 'অমুক' নয়। আমি যার অন্তর্গত সেও সেই মানবলোকের অন্তর্গত। তখন মনে হল, এই মুক্তি। এই অবস্থায় চারদিন ছিলুম... তারপর জ্যোতিদা বললেন, 'দার্জিলিঙ চলো'। সেখানে গিয়ে আবার পর্দা পড়ে গেল... কিন্তু তার পূর্বে কয়দিন সকলের মাঝে যাঁকে দেখা গেল তাঁর সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আর সংশয় রইল না। তিনি সেই অখণ্ড মানুষ যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত—যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।''[৫]

প্রভাতি উপাসনা

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ গভীরভাবে অধ্যয়ন ও মনন করেছেন। অনিবার্য ফলস্বরূপ তাঁর সত্তার গভীরে ব্রহ্মভাবনা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। সেই ব্রহ্ম তথা ঈশ্বরভাবনা গভীরতর হয়েছিল সম্ভবত আরও দুটি কারণে। প্রথমত কেবলমাত্র 'সমাজে'র যৌথ উপাসনায় তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি, আবার পিতার মতো সংসার থেকে নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ঈশ্বর-আরাধনায় নিয়োজিত করেননি। কিন্তু প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্রাহ্মমুহূর্তে যখন সমস্ত প্রকৃতি শান্ত স্তব্ধ, যখন সংসারের কলকোলাহল শুরু হয়নি, সেইসময় তিনি একান্তে উপাসনার আসন বিছাতেন। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে, ভূমার সঙ্গে, পরমাত্মার সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা অনুভব করার সেইটাই ছিল তাঁর বিশেষ ক্ষণ, তাঁর নিজস্ব সময়। যামিনীর শেষ যামে উঠে সেই যে তিনি ভূমার সুরে সুর মিলিয়ে নিজের জীবনবীণা বেঁধে নিতেন, সেই সুরই ছিল তাঁর সারাদিনের ব্যস্ত জীবনচর্যার, তাঁর প্রতি মুহূর্তের চিন্তা, কর্ম ও আচরণের 'টাইটেল মিউজিক'—যদিও কখনও তা শ্রুত, কখনও অশ্রুত।

উপরন্তু ওই প্রভাতি উপাসনার সময় তাঁর 'নিজের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়া'—যার কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন, এবং বেদান্তবাদীর কাছে যা বিচারের মাধ্যমে 'আমার আমিকে খোঁজা', তার সাধনাও করতেন।

দুঃখের বরষা

তাঁর ঈশ্বরচেতনাকে গভীরতর করেছিল ব্যক্তিগত জীবনের বহু ব্যথা-বেদনা। কবির হৃদয়, শিল্পীর হৃদয় অতি কোমল, সূক্ষ্ম এবং তার সংবেদনশীলতাও অনেক বেশি। প্রিয়জনবিয়োগ থেকে শুরু করে তাঁর সাহিত্যরচনার মূঢ় সমালোচনা এবং আরও বহুবিধ বেদনাদায়ক ঘটনা তাঁকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করত সন্দেহ নেই, যদিও তাঁর অসাধারণ সংযমশক্তির জন্য তার প্রকাশ বিশেষ দেখা যেত না। হারানোর মুহূর্তেই মানুষ সব কিছু পায়। দুঃখই তো মানুষকে গভীর করে, তাকে পরমপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে দেয় :

''দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।''

জীবনদেবতা

'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্' ব্রহ্মকে একেবারে আপন

করে নেওয়া, তাঁকে হৃদয়ের দেবতারূপে দেখা, ব্রহ্মের প্রতি নিবিড় প্রেম পোষণ আরও বিশেষভাবে শুরু হল সম্ভবত তখন থেকে যখন তিনি 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'র দেহচেতনার পর্ব অতিক্রম করে ক্রমে 'নৈবেদ্য,' 'কথা ও কাহিনী,' তারপর অধ্যাত্মচেতনার আলোকে আলোকিত, অধ্যাত্মরসে ভরপুর 'গীতালি', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য'র এক একটি কবিতা, পূজা পর্যায়ের এক একটি গান রচনা করতে থাকলেন। কবিতা ও সংগীতে শব্দের স্বল্প পরিসরে ভাবের ব্যাপ্তি ও গভীরতা, হৃদয়ের চরম আর্তি ও আত্মনিবেদন সম্ভব। বিশেষত পূজা পর্যায়ের সংগীতরচনা উপলক্ষ্যে 'বিশ্বদেবতা' তাঁর কাছে 'জীবনদেবতা'রূপে ধরা দিলেন—যে-জীবনদেবতা তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত, তাঁর জীবনতরণীর কর্ণধার, তাঁর 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'র গোমুখ।

ত্রিবেণীসংগম

শান্তিনিকেতনের উপাসনাসভায় যে-আধ্যাত্মিক ভাবকে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন কখনও উপনিষদ, কখনও গীতা, কখনও বা বুদ্ধদেব বা যিশুখ্রিস্টের বাণী উদ্ধৃত করে, তাকে অনেক সংহত, অনেক গভীর, অনেক মনোহররূপে পাই তাঁর কোনও কোনও কবিতায়। তাকেই আরও নিবিড়, নিটোল করে, আরও হৃদয়গ্রাহীরূপে পাই যখন সেই ভাব সংগীতরূপে আত্মপ্রকাশ করে। রবীন্দ্রসংগীতের ভাব-ভাষা-সুরের ত্রিবেণীসংগমে অবগাহন করে মনে হয় পরম একটা কিছু পাওয়া হল। যথার্থ ভাবগ্রাহী রসিকরা সেই গানগুলিকে শুধু একটা সাময়িক ভালো লাগা বা সাময়িক সান্ত্বনা পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে দেখেন না, বরং তার মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার ঊর্ধ্বে বিরাজিত যে-নিত্যধাম, শান্তিধাম, আনন্দধাম, তার সন্ধান পেয়ে তাঁরা কৃতার্থ বোধ করেন।

যতদিন বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি থাকবে ততদিন রবীন্দ্রনাথ থাকবেন, বিশেষত গানের মধ্য দিয়ে। আবার তাঁর পূজা পর্যায়ের কিছু গান, যা আমাদের কালাতীত, দেশাতীত এক সত্তার সন্ধান দেয় এবং যা রসোত্তীর্ণও বটে, সেইগুলি কালজয়ী হবে বলে মনে হয়। এর একটি বিশিষ্ট প্রমাণ—রচনার ন্যূনাধিক শতবর্ষ পরেও তাঁর যেসব গান ভক্ত-অভক্ত সকলের প্রিয় এবং স্থান-কাল-নির্বিশেষে যা বারবার শুনলে ও গাইলেও তৃপ্তি হয় না, সেগুলির অধিকাংশই পূজা পর্যায়ের গান।[৬]

রবীন্দ্রনাথ ধার্মিক না আধ্যাত্মিক

রবীন্দ্রচেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর গভীর ঈশ্বরপ্রেম। সে-সম্বন্ধে অনবহিত থাকলে রবীন্দ্ররচনার মূলধারা সম্বন্ধে ধারণা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। তাঁর রচনাবলিতে সাময়িক আনন্দের আয়োজনের অভাব না থাকলেও তাঁর যে-বৈশিষ্ট্যের জন্যে তিনি রবীন্দ্রনাথ, যা পাশ্চাত্যের সাহিত্যবোদ্ধাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল তা তাঁর সাহিত্যে নিত্যের, সত্যের, আনন্দের নিবিড় উপস্থিতি, যাদের মিলিত নাম ঈশ্বর।

রবীন্দ্রনাথ লৌকিক অর্থে এমন এক ধার্মিক পুরুষ ছিলেন না, যিনি ভগবানে বিশ্বাস করলেও কেবলমাত্র প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজালে বদ্ধ, ভগবানের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক কেবলমাত্র দেনা-পাওনার। তিনি ছিলেন এক উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক পুরুষ। ধর্মের বহিরঙ্গ হল আচার-অনুষ্ঠান আর অন্তরঙ্গ দিক হল আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা এমন একটা বোধ যার দ্বারা ঈশ্বর, বিশ্বপ্রকৃতি, সকল মানুষ এবং নিজের মধ্যে বিরাজিত এক অখণ্ড সত্তাকে উপলব্ধি করা যায়। সবার মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সবাইকে আবিষ্কার করা আধ্যাত্মিকতার মূল কথা। এর দ্বারাই আমাদের গতানুগতিক জীবন থেকে মহৎ জীবনে উত্তরণ ঘটে। 'শান্তিনিকেতন' এবং 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ দুটিতে—যে-দুটি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনার তথা আত্ম-উন্মোচনের মূল্যবান দলিলস্বরূপ—তাদের পাতায় পাতায় আধ্যাত্মিক রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই। শান্তিনিকেতনের উপাসনাসভাগুলিতে তিনি পরমেশ্বরের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ, মানুষের স্বরূপ, চেতনার কোন ভূমিতে তাঁদের মিলন ঘটে, সেই মিলনের স্বরূপ ও ফল, দৈনন্দিন কোন সাধনার দ্বারা সেই স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, তার প্রতিবন্ধকই বা

কী—প্রধানত উপনিষদ থেকে বহু উদ্ধৃতি সহযোগে এবং নিজের জীবনের আলোকে আলোচনা করতেন।

বাংলা সাহিত্য তো বটেই, ভারতের অন্য ভাষার সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত অনন্য পুরুষ যাঁর প্রধান পরিচয় সাহিত্যিক হলেও ধর্মীয় আচার্যের ভূমিকায় যাঁকে আমরা দেখি, এবং তাঁর ক্ষেত্রে সেই ভূমিকাগ্রহণ এতই স্বাভাবিক ছিল যে এ নিয়ে প্রশ্নও ওঠে না—বিশেষত, যখন আমরা জানি তাঁর জীবনের ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিকতা।

মানবধর্ম

১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতামালায় এবং অন্য উপলক্ষ্যেও, বিশেষত বিদেশ ভ্রমণকালে বিভিন্ন বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ যখন মানবধর্মের কথা বলেছেন তখন ঈশ্বরবিযুক্ত, দেশ-কাল-জাতির সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ সীমিত মানুষের কথা বলেননি। তাঁর মানবধর্মের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত মানুষের মধ্যে তিনি সর্বব্যাপী, 'বিশ্বকর্মা' ঈশ্বর তথা ভূমাকে দেখেছেন, বিশ্বমনের অংশরূপে তাকে দেখেছেন, তার অনন্ত সত্তাকে দেখেছেন। বাহ্যিক সর্বপ্রকার তুচ্ছতা, সংকীর্ণতা, ভ্রান্তি তথা অপূর্ণতা সত্ত্বেও সেই মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্ববিকাশের অনন্ত সম্ভাবনা আছে। অন্তর্নিহিত সেই পূর্ণত্বের প্রকাশ ঘটানো, সম্প্রদায়, দেশ ও ধর্মের ঊর্ধ্বে বিশ্বের সকল মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তাস্থাপন, সকল জাতির সঙ্গে মেলবন্ধন, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব এবং তার ফলশ্রুতিতে সত্য ও প্রেম, মঙ্গল ও সৌন্দর্যের উপলব্ধি—তাতেই মানবধর্মের মহিমা ও সার্থকতা।

শক্তির অহংকারে, স্বার্থবুদ্ধি বা মূঢ়তাবশত যখন মানুষ মানুষকে দ্বেষ করেছে, সম্প্রদায় সম্প্রদায়কে ঘৃণা করেছে, জাতি জাতির ওপর অত্যাচার করেছে, দেশ দেশকে আগ্রাসন করেছে তখন সেই মানবধর্ম নিপীড়িত হয়েছে। সেই পরিস্থিতি রবীন্দ্রনাথ নীরবে মেনে নেননি—তার প্রতিবাদ করেছেন, তা সংশ্লিষ্ট মানুষ, গোষ্ঠী বা দেশকে যৎপরোনাস্তি রুষ্ট করতে পারে জেনেও। সেই প্রতিবাদের ভাষাও যে সবসময় কবিসুলভ কোমল ছিল তা নয়—কখনও কখনও তার মধ্যে রুদ্ররোষের ক্ষুব্ধ প্রকাশ থাকত। তা সত্ত্বেও তিনি অন্তরে এ-আশা পোষণ করতেন যে পারস্পরিক বিভেদ, দ্বেষ, হিংসার অবসানে এ-পৃথিবীতে একদিন সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির প্রতিষ্ঠা হবে এবং তার দ্বারা মানবমহিমার জয় ঘোষিত হবে।

ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্

উপনিষদ থেকে যে-সমস্ত মন্ত্রের উদ্ধৃতি তিনি বারবার দিয়েছেন তাদের কয়েকটি : ''ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।/ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥''—জগতে যা কিছু আছে তার সমস্তকে ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করে দেখবে, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে। কারও ধনে লোভ করবে না।

''ওঁ পিতা নোঽসি''—তুমি আমাদের পিতা।

''যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।''—যার দ্বারা অমৃত হব না তা নিয়ে আমি কী করব!

''সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম/ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্,/ সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।''—সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয়স্থ পরমাকাশে বুদ্ধিরূপ গুহার মধ্যে অবস্থিত বলে যিনি দর্শন করেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মরূপে যুগপৎ সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু উপভোগ করেন।

''আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন''—ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জেনেছেন তিনি কদাচ ভয় পান না।

আমি কোথায় পাব তারে

উপনিষদ রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকলেও, হিন্দুদের অন্যান্য শাস্ত্র, বিশেষত গীতা, রামায়ণ, মহাভারত তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বৈষ্ণবসাহিত্য ও বাউলদের জীবনদর্শন ও সংগীত এবং মরমিয়া চিন্তাধারাও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রতি সুগভীর অনুরাগ কবিজীবনের উষাকালে তাঁকে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ওই গীতিকবিতার কারুণ্য, মাধুর্য, আর্তি, সর্বোপরি গীতিময়তা তাঁর গান ও কবিতায় ছায়া ফেলেছে।

উপনিষদুক্ত পরম সত্যের লোকায়ত প্রকাশ তিনি বাউলদের জীবনচর্যায় ও গানে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর বিশেষ প্রিয় একটি বাউল গানের পঙ্‌ক্তি ছিল—''মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ'' অথবা ''আমি কোথায় পাব তারে/ আমার মনের মানুষ যে রে।/ হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে/ দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।''

আধ্যাত্মিকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন আলোচনা পাঠ করে এমন সিদ্ধান্ত করলে সম্ভবত ভুল হবে না যে, ব্রহ্ম উপলব্ধির বিভিন্ন পথ যথা জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান ও ভক্তির মধ্যে ভক্তি তথা প্রেমের পথ বা আরও সঠিকভাবে বলতে হলে জ্ঞানমিশ্রা প্রেমের পথই ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পথ।

প্রেম ও জ্ঞান

তাঁর বেশ কিছু গান ও কবিতার প্রধান উপজীব্য ঈশ্বরপ্রেম। সেই প্রেমকে আশ্রয় করে আরও বহুবিধ ভাব এসেছে যথা শরণাগতি, প্রার্থনা, সীমার মধ্যে অসীম ও রূপের মধ্যে অরূপকে দেখা, সুখে-দুঃখে ও সম্পদে-বিপদে ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব, ঈশ্বরকে না পাওয়ার বা পেয়েও হারানোর বেদনা, ঈশ্বরানুভূতির নিবিড় আনন্দ ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও প্রেমের পরিণতি এক হলেও সাধনমার্গ হিসেবে তাদের পার্থক্য তো আছেই। জ্ঞান মস্তিষ্কনির্ভর, কিন্তু প্রেম হৃদয়-নির্ভর। কাব্যের উৎস মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়—সেইজন্য কবির ঈশ্বর-আরাধনার মার্গও হৃদয়নির্ভর, তথা প্রেম। ধর্ম-আলোচক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জ্ঞানমিশ্রা প্রেমের ভাব প্রবল। কিন্তু কবি বা গীতিকার হিসেবে তাঁর মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেমের ভাবই প্রধান—সেখানে জ্ঞানবিচারের কাঠিন্য প্রায় নেই।

দেবতারে প্রিয় করি

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রেম এমন একটি বৃত্ত যার কেন্দ্র সর্বত্র কিন্তু পরিধি নেই কোথাও। সেখানে ঈশ্বর, জীব, বিশ্বপ্রকৃতির ভেদরেখা লুপ্ত। সেই বোধের অপরূপ কাব্যিক প্রকাশ : 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।' সাধনার প্রথম স্তরে দেবতা ও প্রিয়জনের অবস্থান ভিন্ন; দেবতা শ্রদ্ধেয় কিন্তু প্রিয় নন, আবার ভালোবাসার মানুষ প্রিয় কিন্তু সে-ভালোবাসায় দিব্য ভাবের অভাব। সাধনার দ্বিতীয় স্তরে দেবতাকে প্রিয় করার সাধনা এবং প্রিয়ের মধ্যে দেবতার অন্বেষণ। সাধনার চরমস্তরে দেবতা ও প্রিয় অভেদ।

মুক্তিপ্রয়াসী ভক্ত যিনি দেবতাকে ভালোবাসেন, যিনি পরিবার-পরিজনকেও ভালোবাসতে চান অথচ আসক্তির জালে বদ্ধ হতে চান না, তাঁর কাছে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ—ভালোবাসাকে কীভাবে অনাসক্ত করা যায়। সেই চ্যালেঞ্জের সার্থক মোকাবিলা সম্ভব যদি প্রিয়েরে দেবতা করা যায়, অর্থাৎ প্রিয়জনের মধ্যে দেবতার সান্নিধ্য অনুভবের সাধনা করা যায়। সেই সাধনার পরিণামে, আবিল ভালোবাসার অনাবিল ভালোবাসায় উত্তরণ ঘটে। চিত্তকে তা আসক্তির মোহ থেকে মুক্ত করে নিজের ও প্রিয়জনেরও শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ উপলব্ধি করায়। *ক্রমশ*

তথ্যসূত্র

১। R. C. Majumdar, *British Paramountcy and Indian Renaissance*, Part II - (Gen. Ed.) : *The History and Culture of Indian People*, Vol. 10, Part II, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 3rd ed., pp. 97-102

২। Matthew Arnold, *Shakespeare, The Oxford Book of English Verse* (1250-1900), Chosen and edited- A.T. Quiller-Couch, Oxford. Clarendon, 1919, Poem No. 753

৩। *রবীন্দ্ররচনাবলী* (বিশ্বভারতী : কলকাতা, ১৯১১), খণ্ড ৯, *সঞ্চয়*, পৃঃ ৫৩১

৪। তদেব, খণ্ড ১০, *মানুষের ধর্ম*, পৃঃ ৬৫৪

৫। তদেব

৬। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বরেণ্য সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে যেমন স্বামী নির্বেদানন্দজী, প্রেমেশানন্দজী, তেজসানন্দজী, গম্ভীরানন্দজী, ভূতেশানন্দজী প্রমুখ রবীন্দ্রনাথের পূজার গানগুলি বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। জানা যায় যে এক সময়ে মঠবাড়ির গঙ্গার দিকের একতলার বারান্দায় রবীন্দ্রনাথের দুটি পঙ্‌ক্তি লেখা থাকত : ''তোমার করুণা কোন পথ দিয়ে কোথা লয়ে যায় কাহারে/ সহসা নয়ন মেলিয়া দেখিনু এসেছি তোমারি দুয়ারে।''